



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 813 - 818

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

লোকসমাজে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার স্বল্প জনপ্রিয় চতুঃমন্দির : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

নম্রতা দত্ত

মুক্ত গবেষক

Email ID: nupurdutta00869@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Rani Rasmoni,
Idol ship,
Laxman Sen,
Jhahura, Porama,
Bethuyadahari
Wildlife Sanctuary,
Tourist spot,
Facebook,
You tube.

Abstract

Nadia district is more famous for the bhakti movement of Srichaitanya Mahaprabhu than the battle of Plassey. From the reign of the Sena ruler Ballal Sena -2, Bengal gradually became the melting pot of Hinduism, Buddhism and Islam. Nadia district continues its tradition of cultural map of Nadia district, we see the Mayapur birthplace of Srichaitanya, Porama temple of Nabadwip, Maa Jhahura temple of Ranaghat, Sati Maa temple of Kalyani and the Prabhupada Vajranath temple of Gayespur, Kalyani, which play a significant role in the propagation of divine thought and consciousness. Additionally, the worship of Ulai Chandi of Birnagar and the Sufi Pir Dargah in the Karimpur area of Nadia district highlight the rich cultural heritage of the district. However, the most popular tourist attractions of Nadia and North 24 Parganas are - Burima of Krishnanagar, Boro Kali of Naihati. Besides these, there are several other historical important places of interest in Nadia and North 24 Parganas, such as Jahura Kali Bari of Ranaghat. On one hand, the form of this Goddesses idol is different from other Kali idols. Its worship rituals are also unique. The name of King Laxman Sen of Bengal is associated with the establishment of this deity. The Pora Ma Tala of Nabadwip bears witness to a different history. The Kulia Path fair began in Gayespur centered around the arrival of Mahaprabhu. Rani Rashmoni's daughter built the Annapurna temple near Barrackpore. But for some unknown reason, society has kept its distance from these sites. Research scholars also did not show their interest in it and kept aloof. However, with a collective effort, these places could have become important tourist destinations, which could strengthen the local community.

Discussion

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ধর্মীয় গুরুত্ব, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলা নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণা। ফুলিয়ার কৃষ্ণবাসের ভিটা, শান্তিপুরের তাঁতশিল্প, নবদ্বীপের বিদ্বান সমাজ, মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র, মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দির, বামানপুরের বঙ্গাল রাজার টিবি, কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি, ক্যাথলিক চার্চ, ঘূর্ণির

মৃৎশিল্প, বেথুয়াডাহারির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকেন্দ্র হিসেবে নদীয়া ক্রমপিনাসু জনসমাজে আকর্ষিত। পাশাপাশি দ্রুত নগর উন্নয়ন, সুবিধাজনক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, তথ্যপ্রযুক্তির কারণে মহানগর সংলগ্ন জেলা উত্তর ২৪ পরগণা জনসমাজে বিশেষভাবে আলোচিত। আবার উৎসবের মরসুমে দেখা যায় সম্প্রতি জঙ্ঘধাত্রী পূজাকে কৃষ্ণনগরের চাষাপাড়াতে কেন্দ্র করে ‘বুড়িমা’, নৌহাটির ‘বড়মা’-কেন্দ্রীক ঐশ্বরিক আবেগ জেলার ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তি বিভিন্ন জেলায় পৌঁছে যাচ্ছে। আবার শান্তিপুুরের ঐতিহ্যবাহি রাস উৎসব জনপ্রিয়তারও কোনো খামতি নেই। পাশাপাশি গবেষকদের গবেষণার জন্যও নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর অত্যন্ত প্রিয় ক্ষেত্র ও তাঁদের আলোচনার মধ্য দিয়ে বারবার নবদ্বীপের বিদ্বান সমাজ, মহাপ্রভু, তাঁত শিল্প, ঘূর্ণির মৃৎশিল্পের কথা ফুটে উঠেছে। কিন্তু নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় চেনাপরিচিত জনপ্রিয় এলাকাগুলি ছাড়াও বেশকিছু স্থান রয়েছে যেগুলো লোকসমাজে প্রায় স্বল্প পরিচিত এবং সেই সমস্ত ক্ষেত্রগুলি নিয়ে ইতিহাসের দৃষ্টিতে কোনোপ্রকার আলোচনা প্রায় হয়নি বললেই চলে। এই বিষয়ে নবদ্বীপের পোড়ামা তলা, রানাঘাটের জহুরা কালীমন্দির, গয়েশপুরের অপরাধ ভঞ্জন মন্দির ও কুলিয়া পাঠের মেলা, ব্যারাকপুরে রানী রাসমণির কন্যা জগদম্বার অন্নপূর্ণা মন্দির নাম বিশেষভাবে করা যায়। আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এই অনালোকিত দিকগুলিতে আলো ফেলার চেষ্টা করা হবে।

প্রচলিত মতানুসারে ভাগীরথীর তীরে জনৈক তন্ত্রসাধক নয়টি প্রদীপ জ্বালিয়ে তন্ত্রসাধনা করতেন। সেখান থেকেই নদীয়া নামের উৎপত্তি। ‘নদীয়া’ নামের অর্থ ধর্মীয় স্নিগ্ধতা লেগে রয়েছে। স্মরণে রাখা আবশ্যিক, ধর্ম-এর প্রকৃত অর্থ হল জ্ঞান, পারস্পরিক ভরসা, নৈতিক আচরণ, সম্মতি, স্নেহ, প্রেম, নম্রতা, সম্মান। ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল মন্দির। মন্দির কেবল ধর্মীয় উপাসনার স্থল নয়। মন্দির একদিকে আরাধ্য ও ভক্তের মধ্যে বিশ্বাস, ভরসার স্থল অন্যদিকে মন্দির স্থাপত্য মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, এলাকাবাসীর আর্থিক অবস্থা, সংস্কৃতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের মন্দিরগুলি দুটি ধারায় বিভক্ত – ১) উত্তর ভারতের নগর ধারার মন্দির এবং ২) বিদ্যাপর্বতের দক্ষিণে করমণ্ডলের দ্রাবিড় ধারার মন্দির এবং এই দুই ধারার মিশ্রণ হল বেসর ধারা।^১ বাংলায় মন্দিরগুলি মূলত রেখ দেউল, পিড় দেউল, শিখর দিয়ে ঘেরা ভদ্রদেউল এই তিনধারায় বিভক্ত।^২ সেই সাথে চালা শৈলী ও রত্নশৈলীর মন্দির দেখা যায়। প্রায়শই দেখা যায়, কোনো অঞ্চলের মন্দির নিয়ে আলোচনা করা মানেই সেই অঞ্চলের খ্যাতনামা জনপ্রিয় মন্দিরগুলির স্থাপত্য শৈলি নিয়ে আলোচনা করা। এর আড়ালে চাপা পড়ে যায় অ-জনপ্রিয় আঞ্চলিক বিভিন্ন মন্দিরের সাথে জড়িত ইতিহাস, স্থাপত্য, লোকবিশ্বাসের কথা। নদীয়ার নবদ্বীপের পোড়ামা তলা, রানাঘাটের জহুরা কালীমন্দির, কল্যাণীর ঘোষপাড়ার সতীমার থান ও সতীমার মেলা, গয়েশপুরের অপরাধ ভঞ্জন মন্দির ও কুলিয়া পাঠের মেলা, ব্যারাকপুরে রানী রাসমণির কন্যা জগদম্বার অন্নপূর্ণা মন্দির এর ব্যতিক্রম নয়।

নবদ্বীপের পোড়ামা তলা : বৈষ্ণব ধর্মচর্চা ও বিদ্বান সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ভাগীরথী ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপ সেন রাজাদের আমল থেকে গড়ে উঠতে থাকে।^৩ এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। হিন্দু সমাজের সংস্কারসাধন এবং ব্রাহ্মণদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটানো নবদ্বীপ সমাজের মূল উদ্দেশ্য।^৪ মহাপ্রভু ‘হরে কৃষ্ণ’ ও ভক্তিবাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। যা নবদ্বীপকে বৈষ্ণব আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। বৈষ্ণবদের অত্যন্ত সম্মানীয় প্রিয় স্থল নবদ্বীপের সুপ্রাচীন ধর্মীয় স্তম্ভ পোড়ামার অস্তিত্ব। ‘নবদ্বীপ’ – মহিমা’ গ্রন্থে উল্লেখিত প্রবাদনুসারে ১৩০০ খ্রিঃ অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেন সিংহাসন হারাবার প্রায় ১০০ বছর পর দক্ষিণাকালী মন্ড্রে দীক্ষিত জনৈক তান্ত্রিক পোড়ামা স্থাপন করেন।^৫ আবার গদাধর বংশের রামগোপাল তর্কতীর্থের মতে, দক্ষিণাকালী সাধক সিদ্ধান্তবাগীশ ঘটনাচক্রে তাঁর ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করতে গেলে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে বসত বাড়ি পুরে যায় এবং মন্দিরের মধ্যে গোপালকে কোলে নিয়ে দেবীর ভয়াবহ মূর্তি দেখা যায়।^৬ মন্ত্রপূত জল দ্বারা সাধক নিজে বেঁচে যান এবং মন্দিরের দুইটি ইট বেঁচে যায়।^৭ এই ইট দুটি এখনও পোড়ামার আধার হিসেবে তার উপর ঘট স্থাপন করে দেবীর পূজা করা হয়। আবার কারো মতে কোন এক সময়ে এই বটগাছটি অগ্নিদগ্ধ হলে দেবী পোড়মা বা বিদগ্ধজননী বলে পরিচিত হন। আরও জানা যায়, কোনো এক সময়ে রানী রাসমণির গুরুদেব উমাচরণ ভট্টাচার্য এই পোড়ামা তলায় সাধনা করতেন।^৮ সেই সময়ে দেবী পোড়ামা নয় ভবতারিণী হিসেবে পরিচিতা ছিলেন। অনেকের মতে,

পঞ্চদশ শতকে বৃহদ্রথ নামে এক তন্ত্রসাধক নবদ্বীপের এক জঙ্গলে দেবী কালির ঘট স্থাপন করেন।^{১৬} সাধকের মৃত্যুর পর বাসুদেব সার্বভৌম এবং তিনি এই ঘট এক গাছ তলায় স্থাপন করেন।^{১৭} এই ঘটে পরবর্তীতে দেবী দক্ষিণাকালীর পূজা হয় এবং এই দেবী সময়চক্রে পোড়ামায় রূপান্তরিত হন।^{১৮} এই দেবীর কোনো মূর্তি নেই। মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশন এই মন্দিরেরই হয়েছিল বলে বহু ভক্তপ্রাণ মানুষ বিশ্বাস করেন।^{১৯} মন্দিরটি এক সুপ্রাচীন বটগাছের গোড়ায় অবস্থিত। ত্রিকোণ চূড়া বিশিষ্ট প্রায় তিনফুট উচ্চতার মন্দিরটির চারিপাশে বটঝুড়ি মন্দির চাতালটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। যার ফাঁক দিয়ে কড়া সূর্যের আলো পৌছাতে পারে না ফলে মন্দিরের চূড়া বা গঠনরীতি সঠিকভাবে নজরে আসে না বলেই চলে। স্থানীয় লোকবিশ্বাস অনুসারে পোড়ামার পূজা দিয়ে এই বটগাছের ঝুড়িগুলিতে ঢিল বাধলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। মানতের পূজার পাশাপাশি অনেকে নববধূর জন্য এখান থেকে দেবীর আশীর্বাদী পলা নিয়ে যান। দেবী সারা বছর দক্ষিণা কালী হিসেবে পূজিত হলেও শ্রী পঞ্চমী তিথিতে নীল সরস্বতী হিসেবে পূজিত হন। মন্দিরে মূলত স্থানীয় লোকজনের ভিড় বেশি নজরে আসে। পার্শ্ববর্তি জেলা থেকে তেমন ভক্ত বা উৎসাহী পর্যটকের তেমন আগমন এই মন্দিরে নেই বললেই চলে। এই দেবীর মূল প্রসাদ বাতাস। মন্দির ঘিরে এলাকাসী অসংখ্য পূজা সামগ্রীর দোকান সাজিয়ে বসে। বর্তমানে এই পোড়ামা তলায় লোকায়ত দেবী পোড়ামার সাথে ভবতারণ শিব, ভবতারিণী কালী, বুড়ো শিবতলার বুড়োশিবকে পূজা নিত্য পূজা করা হয়।

রানাঘাটের জহুরা কালীমন্দির : রানাঘাটের মূল শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে শান্ত গ্রাম্য পরিবেশ নোকারিতে রয়েছেন দেবী কালীর আরেক রূপ মা জহুরা। মন্দিরে প্রবেশদ্বারের খোদাই অনুসারে ১৩৭৩ সালে শ্রী যুগল কিশোর নন্দী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।^{২০} জনশ্রুতি অনুসারে ১১৫৯ - ১১৭৯ সালে রাজা বঙ্গাল সেন দ্বারা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। কারো মতে, প্রায় ১০০০ বছর আগে রাজা লক্ষ্মণ সেন মালদায় শিলাখণ্ড দিয়ে দেবী মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করে পূজা শুরু করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই মন্দির, মূর্তি হুসেন শাহ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে স্থানীয়রা মূর্তিকে শিলাখণ্ড দ্বারা মাটির নীচে চাপা দেয়। এরপর স্বপ্নাদিষ্ট যুগল কিশোর রানাঘাটের নোকারিতে মন্দির নির্মাণ করে জহুরা কালীর পূজা শুরু করেন। কারো মতে, এটি ডাকাতকালী। এই মন্দিরের ফটকটি ষড়ভুজ আকৃতির, বারান্দায় চারটি থাম, বারান্দা ও গর্ভগৃহ একতলা সমতল ছাদ বিশিষ্ট। মূল মন্দিরের পাশে গম্বুজ আকৃতির গ্রহরাজ মন্দির রয়েছে। চুন, ছোট ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে বানানো মন্দিরটির দেওয়ালগুলো স্যাঁতস্যাঁতে প্রকৃতির। বর্তমানে সাদা মার্বেলের মেঝে মন্দিরটিতে আধুনিকতার ছাপ ফেলেছে। চেনা-পরিচিত কালীমূর্তির মত মা জহুরার রক্তবর্ণ জিহ্বা দৃশ্যমান হলেও বাকি রূপের সাথে মা জহুরার রূপের ও পূজার পার্থক্য চোখে পড়ার মত। মা জহুরাকালীর সাথে শবাসনের শিব মূর্তি নেই। মহাকালীর প্রতিনিধিত্বকারী মা জহুরার দুপাশে রয়েছেন উচ্চতায় কিছুটা ছোট প্রায় একই দেখতে মহালক্ষ্মী, সরস্বতীর প্রতিনিধিত্বকারী আরও দুই দেবী-মূর্তি। আবার কারো মতে মাঝের মূর্তিটি ছিন্নমস্তার এবং দুই পাশে তাঁর সহচরী ডাকিনী, যোগিনী। লক্ষ্মণীয় প্রায় ৫ ফুট উচ্চতার এই তিনটি মূর্তি কোনো মৃত্তিকার বা ধাতু বা পাথরের নয়, কাঠের কাঠামো এবং তিনটি কাঠামোর কোনো হাত-পা নেই। দেবী ত্রয়ের কাঠামোর মুখ রক্তবর্ণ, দু'পাশের স্থাপদ দাঁত বেরিয়ে, মাথায় বিশাল জরির মুকুট, দেহে রঙিন কাপড় জড়ানো, মূর্তির নীচে সিন্দুর লাগানো শিলাখণ্ড রয়েছে। দেবীকে মালা, সিন্দুর পড়ানো, পূজা দেওয়া ইত্যাদি জাত-ধর্ম-নির্বিশেষে ব্রতী নিজের হাতে করেন, সম্মুখের কাঁঠাল গাছে মানতের কাপড় বাঁধেন, কোনো দক্ষিণা দিতে হয় না। যা প্রমাণ করে ভক্ত ও ভগবানের মাঝে কোন ব্রাহ্মণ কিংবা অর্থমূল্য থাকতে পারে না। প্রতিবছর দীপাশ্বিতা কালীপূজার সময় মন্দির চত্বর উৎসবের রূপ নেয় এবং প্রচুর জনসমাগম ঘটে।

গয়েশপুরের অপরাধ ভঞ্জন মন্দির ও কুলিয়া পাটের মেলা : কল্যাণী শহরের থেকে বেশ কিছুটা ভিতরে গয়েশপুরের ১৮ নং ওয়ার্ডের কুলিয়া এলাকা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ক্ষেত্র। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পাট কথার অর্থ পবিত্র স্থান বা তীর্থভূমি। সেজন্য এই অঞ্চল কুলিয়া পাট ও পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত মেলা কুলিয়া পাটের মেলা নামে পরিচিত। এই স্থানে গৌরঙ্গ মহাপ্রভু অধ্যাপক চাপাল গোপালকে 'শ্রীবাস অপরাধ' থেকে মুক্তি দেন।^{২১} সেই অর্থে এখানে অবস্থিত গৌরঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির 'অপরাধ ভঞ্জন মন্দির' নামে পরিচিত ও মেলা আবার 'অপরাধ ভঞ্জনের মেলা' নামেও পরিচিত।

ভগবতবেত্তা মায়াবাদী পণ্ডিত দেবানন্দের ভক্তাপরাধ মার্জনা করে বর প্রদান করেন।^{১৫} জনৈক কৃষ্ণানন্দ বৈষ্ণবাপরাধে কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরেও মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ থেকে মুক্তি লাভ করেন।^{১৬} এই সমস্ত ঘটনার জন্য বৈষ্ণবরা এই স্থানকে পবিত্র বলে মনে করেন। একসময়ে এই স্থানটি গঙ্গাক-যমুনার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে নদী দুটি মজে গেছে। এছাড়াও এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, শিবলিঙ্গ ও অন্যান্য দেব বিগ্রহ রয়েছে। জানা যায়, প্রায় ৭৬ বছর পূর্বে জনৈক বৈষ্ণব এখানে নিতাই ও অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপন করে পূজা শুরু করেন। এর কিছু সময় পর খড়দহ থেকে এক গোস্বামী শিষ্য এই স্থানে আসেন এবং সে তার সাথে নিতাই সেবা করতে আরম্ভ করেন।^{১৭} জনৈক বৈষ্ণবের মৃত্যু হলে গোস্বামী শিষ্য এবং তার পরবর্তী বংশধররা নিতাই ও অন্যান্য বিগ্রহদের বিধিবত পূজা শুরু করেন।^{১৮} এসময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়-এর খুড়তুতো বংশীয় তথা সুখসাগর, কুলিয়া, পলতা প্রভৃতি অঞ্চলের অধিপতি রামকুমার রায়ের তৃতীয় পুত্র মাধবচাঁদ রায় লালিটা সাহেবের থেকে সুখ সাগরের কনসারণ নীলকুঠি লাভ করে প্রভূত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।^{১৯} তিনি তাঁর বন্ধু অচ্যুতানন্দের অনুরোধে লাঠিয়াল দিয়ে এই কুলিয়া পাটের অধিকার খড়দহের গোস্বামীদের হাত থেকে কেড়ে অচ্যুতানন্দকে দেন। এরপর অচ্যুতানন্দ ও তাঁর বংশধরদের সহচর্যে কুলিয়া পাটের জৌলুস বাড়তে থাকে। আবার স্থানীয় মতে মহাপ্রভুর গয়েশপুর আগমনের স্মৃতিতে প্রতি বছর অগ্রহায়ণের কৃষ্ণ - একাদশী তিথিতে মজে যাওয়া যমুনা নদী বা মথুরা বিলের তীরে ১০ দিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়।^{২০} এই মেলা অপরাধ ভঞ্জন মেলা নামে পরিচিত হলেও কুলিয়া পাটের মেলা হিসেবেই অধিক পরিচিত। অন্যান্য সামগ্রীর সাথে এই মন্দিরে পূজার মূল উপকরণ কুলো, মূলো। চতুর্ভুজ আকৃতির এই মন্দিরের সামনের দিকে চারটি থাম দেওয়া সমতল ছাদবিশিষ্ট খোলা বারান্দা এবং গর্ভগৃহের সমতল ছাদের উপর দেউল বা পিরা দেউল আকৃতির শিখর দেখা যায়। এই মন্দিরের চারিপাশে ছোট ছোট চারচালার কিছু মন্দির রয়েছে। বৃন্দা দেবীর মন্দিরের একপাশে রয়েছে অপরাধী চাঁপাল গোপাল দাসের সমাধি। এরপাশে রয়েছে বাজ্রকল্প তরুগাছ। ভক্তরা মনস্কামনা করে এই গাছে ঘোড়া বাঁধেন। প্রতিবছর মেলার সময় স্থানীয় ও আশেপাশের এলাকা থেকে প্রচুর জনসমাগম হলেও বছরের অন্যান্য সময় প্রায় ফাঁকা থাকে।

ব্যারাকপুরে রানী রাসমণির কন্যা জগদম্বার অন্নপূর্ণা মন্দির : কলকাতার খুব কাছেই ব্যারাকপুর মানেই কেতাদুরস্ত শহরের আরেক নাম। কিন্তু মূল শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে শহরের আরেক চিত্র দেখা যায়। গান্ধীঘাট থেকে কয়েক মিটার দূরত্বে তালপুকুরে রয়েছে রানী রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার নির্মিত দেবী অন্নপূর্ণার নবরত্ন মন্দির যা স্বর্গীয় ভাবনার এক অসাধারণ তীর্থস্থান। দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পর ১৮৭৫ সালের ১২ই এপ্রিল বাংলার ১৮২১ বঙ্গাব্দের ২রা চৈত্র অন্নপূর্ণা মন্দির নির্মিত।^{২১} মন্দির উদ্বোধনের সময় স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব উপস্থিত ছিলেন। বলা হয় ১৮৪৭ সালে রানী রাসমণি জামাতা মথুরা মোহন বিশ্বাসসহ কাশী যাত্রার সময় রানী রাসমণি গঙ্গার পূর্ব পাড়ে মন্দির নির্মাণ ও নিত্যপূজার স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাশী না গিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।^{২২} কিন্তু কাশীযাত্রা সম্পূর্ণ না হওয়ায় রানীর মনে ইচ্ছা হয় অন্নপূর্ণা মন্দির স্থাপন করার।^{২৩} যা রানীর মৃত্যুর পর প্রায় তিন লাখ টাকা খরচ করে নির্মাণ করা হয়। সিংহমূর্তিযুক্ত প্রধান ফটক পেরিয়ে ইটের তৈরি উঁচু বেদির উপর রয়েছে অন্নপূর্ণার মন্দির এবং ততারপাশে রয়েছে নাটমন্দির। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে তৈরি হলেও দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি পার্থক্য হল অন্নপূর্ণার মন্দিরে ভবতারিণীর বদলে রূপার সিংহাসনের উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন অন্নপূর্ণা। দেবী অন্নপূর্ণা অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত। তিনি অন্নভাণ্ডার হাতে নিয়ে রয়েছেন ও দেবীর ডান দিকে ত্রিশূল ও ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে শিবমূর্তি। শিবমূর্তিটি রূপার নির্মিত। মূর্তি দুটির পিছনের একচালাটিও রূপার। মূল মন্দিরে প্রবেশের জন্য দক্ষিণ, পূর্ব, উত্তর দিকে সিঁড়ি রয়েছে। অপর পার্থক্য হল এখানে ১২টির বদলে কল্যাণেশ্বর, কাশেশ্বর, কিল্মেশ্বর, কেদারেশ্বর, কৈলাশ্বর, কপিলেশ্বর এই ৬টি আটচালার শিবমন্দির রয়েছে। নিত্যভোগ আরতি দ্বারা দেবদেবী পূজিত হন। বলা হয় দেবী অন্নপূর্ণা সকলের অন্নকষ্ট দূর করেন। এদিকে রাসমণি ঘাট তীরস্থ এই মন্দিরের আশেপাশে সমাজের আর্থিক দিক থেকে দুর্বল, প্রায় অশিক্ষিত মানুষদের বাস। তাঁদের জন্য মাথা গোজার ঠাই হয়েছে অস্থায়িক বস্তি এলাকা। মন্দিরের বাইরে পূজা সামগ্রী নিয়ে যে গুটি কয়েকজন ব্যবসা করেন তাঁদের কারো কারো ব্যবসায় বৌনি হয় মন্দির প্রায় বন্ধের সময় দুপুর ১২টায়। সেই বউনিতেই অনাবিল আনন্দ তাঁদের চোখমুখে ফুটে ওঠে। সেখানে অন্যান্য এলাকা এমনকি মুর্শিদাবাদের পূজা সামগ্রী

বিক্রেতার সাকাল থেকে কয়েক হাজার টাকার ব্যবসা করেও আরও কিছু লাভের আশায় চিন্তিত হয়ে দুপুর শেষে ব্যবসা গুটান। যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়মিত নয়। প্রায় অবিকল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মত হলেও দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রায় হাতে গোনা। এই মন্দিরের উপর প্রচারের আলো পড়লে এটি জনবহুল পূজা ক্ষেত্র ও শক্তিশালী পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হবে এবং স্থানীয় এলাকাবাসীর আর্থিক দুর্বলতা কেটে সুস্থ জীবন লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

প্রাচীন শিক্ষা, হস্তচালিত শিল্পকলা, মিষ্টান্ন শিল্প, কবি জয়দেব, মহাপ্রভু, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দীনবন্ধু মিত্র, বসন্ত কুমার বিশ্বাস তথা ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত নদীয়া আপামর জনসাধারণের নিকট সুখ্যাত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সময়ে দেখা যায়, নদীয়ার বিভিন্ন সবুজঘেরা, শান্ত, নিরিবিলা, উন্নত আধুনিক সুযোগসুবিধায় ভরপুর বিভিন্ন গ্রাম ও শহর আকর্ষিত। ধর্মীয় দিক থেকেও লক্ষ্যণীয় মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দির, নবদ্বীপ ধাম জাত, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থভূমি ও পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আর্থিক দিক থেকে প্রায় পিছিয়ে থাকা মানুষের এলাকায় মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দিরের অবস্থান। কিন্তু বিশ্বখ্যাত এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনীয় শ্রমিক নিয়োগ, স্থানীয় হস্তশিল্প, পোশাক শিল্প, দুগ্ধ, বাদ্যযন্ত্র, আতিথেয়তা শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও তার সহযোগী প্রকল্পগুলি এই গ্রামীণ এলাকার আর্থিক উন্নয়নে সহায়ক হয়ে উঠেছে। সেই সাথে নাকাশিপাড়া ব্লকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা কৃষিপ্রধান এলাকা বেথুয়াডাহারির অভয়ারণ্যকে ঘিরে প্রচুর পর্যটকের আগমন ঘটে। পর্যটকদের সুবিধার্থে প্রচুর ছোট-বড় খাবারের দোকান, হোটেল, লজ গড়ে উঠেছে। তাছাড়া স্থানীয় কিশাণ মাণ্ডি বা পাইকারি সবজি বাজার, কাঠের আবসবাবত্রের ব্যবসা, আধুনিক আবাসন প্রকল্প স্থানীয় আর্থিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তুলছে। অপরদিকে নদীয়ার প্রতিবেশী জেলা উত্তর ২৪ পরগণা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র, সাহিত্য সম্রাটের ভিটে, কোদালিয়ায় নেতাজির ভিটে হিসেবে ইতিহাসে ও জনমানসে সুখ্যাত। আদতে আরো দেখা যায় জনমানসের নিকট নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা মানে মায়াপুর, নবদ্বীপ দুই কৃষ্ণক্ষেত্র, কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী কালীবাড়ি, রোমান ক্যাথলিক চার্চ, শান্তিপুুরের শ্যামচাঁদ মন্দির, ছোট ও বড় গোঁসাই মন্দির, উত্তর ২৪ পরগণার হালিশহরের সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি, সাধক রামপ্রসাদের ভিটা, শ্যামনগর কালীবাড়ি, নৈহাটির বড়কালী, ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাণ্ডে ঘাট, গান্ধীঘাট। এবং মরসুমি আবহাওয়ায় এই সমস্ত এলাকায় উৎসাহী পর্যটকদের ভিড় নজরে আসার মত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ইতিহাস বিজড়িত এবং বাংলার মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন নদীয়ার নবদ্বীপের পোড়ামা তলা, রানাঘাটের জহুরা কালীমন্দির, গয়েশপুরের অপরাধ ভঞ্জন মন্দির ও কুলিয়া পাটের মেলা, উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে রানী রাসমণির কন্যা জগদম্বার অল্পপূর্ণা মন্দির সম্পর্কে জেলার বাইরের এমনকি জেলাবাসীর আগ্রহ তেমন নজরে আসে না। বলা ভালো জেলাবাসীর অনুৎসাহে প্রায় অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে এই চারটি স্থান। আলোচ্য মন্দিরগুলি জেলার যে এলাকাগুলিতে অবস্থিত সেখানে সমাজের আর্থিক দিক থেকে দুর্বল মানুষের বাস। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কল্যাণীর মূল এলাকা উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গুনগত চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিল্পতালুক ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বসবাসের জন্য চর্চিত। কিন্তু এই কল্যাণীর গয়েশপুরের মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানার অভাব দেখা যায়। স্থানীয়দের মধ্যে হাতে গোনা মানুষজন নিজ উদ্যোগে এলাকার বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। এলাকার বাকি মানুষজন স্থানীয় ছোট-মাঝারি মাপের ব্যবসার সাথে যুক্ত। আবার ভাইসরয়দের অবসর কাটানোর এলাকা ব্যারাকপুরে উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খাদ্য, পোশাক বিপণির মেলা থাকলেও স্টেশন থেকে মাত্র দুই কিমি দূরে অবস্থিত শিব শক্তি অল্পপূর্ণা মন্দির এলাকায় শিক্ষার আলো যেখানে যৎসামান্য প্রবেশ করেছে। যেখানে দিন আনা দিন খাওয়া লোকের বাস। এরূপ এলাকায় মানুষের আর্থিক ভিত্তি, পেটের ভাত জোগাড়ের অন্যতম শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে আলোচ্য মন্দিরগুলি। মন্দির কেন্দ্রিক পূজা সামগ্রীর দোকান, খাবারের দোকান, বাচ্চাদের খেলনাসামগ্রীর দোকান, হোটেল, রাত্রিনিবাস গড়ে উঠলে তা এলাকাবাসীর আর্থিক ভিত উন্নয়নে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু দেখা যায়, মায়াপুর, দক্ষিণেশ্বর, মত দিগ্বিদিক সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়া তীর্থভূমি কিংবা বেথুয়াডাহারির মত জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র না হওয়ার দরুণ মরসুম বাদ দিয়ে বছরের বেশিরভাগ সময় নবদ্বীপের পোড়ামা তলা, রানাঘাটের জহুরা কালীমন্দির, গয়েশপুরের অপরাধ ভঞ্নের মন্দির, উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে রানী রাসমণির কন্যা জগদম্বার অল্পপূর্ণা মন্দিরপ্রায় ফাঁকা থাকে। ফলে অন্যান্য জনপ্রিয় ধর্মীয় স্থান, মেলায় স্থানীয়রা যে পরিমাণে আয় করে এখানকার

স্থানীয়দের সেই সুযোগ নেই বললেই চলে। সবুজ প্রকৃতির কোলে থাকা রানাঘাটের জহুরা কালীবাড়ি চলে পারিবারিক উদ্যোগে। মন্দিরে নেই কোনো চটকদার কারুকার্য, রঙ, আছে স্বহস্তে পূজার মাধ্যমে সরাসরি আরাধ্যা বা দেবীর সাথে ভক্তের যোগাযোগ যা আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটায় দেয় স্বর্গীয় শান্তি। কিন্তু লোকসমাজ স্বর্গীয় শান্তির বদলে ইট-পাথরের শান্তিতে আকৃষ্ট হয় বেশি। ফলে জহুরার মন্দির, ভক্তের দেবী লোকসমাজে থাকে অনাদৃত। অন্যদিকে নবদ্বীপের পোড়ামা তলা, গয়েশপুরের অপরাধ ভঞ্জন মন্দির, উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে রানী রাসমণির কন্যা জগদম্বার অল্পপূর্ণা মন্দিরে আর পাঁচটা জনপ্রিয় দেবালয়ের মত দেব ও ভক্তের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বাঁধা থাকলেও, উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা থাকলেও জহুরার মত এরাও লোকসমাজে অজানা কারণে অনাদৃত। অন্যান্য জনপ্রিয় মন্দির সংলগ্ন দোকানগুলি সারাদিন বিক্রিবাটা করে কয়েকশ টাকা লাভ করে মধ্যাহ্নে জিরাতে ব্যস্ত, সেই সময়ে আলোচ্য মন্দির সংলগ্ন হাতেগোনা গুটি কয়েক দোকানগুলি সবে বউনি করে। এক্ষেত্রে এই দশা কাটিয়ে উঠতে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, সমাজমাধ্যমগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ফেসবুক, ইউটিউব-এর মত বিভিন্ন সমাজমাধ্যমগুলি তুলে ধরে এই মন্দির ও এলাকাগুলোকে জনসমাজে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। ফলে আলোচ্য এলাকাগুলি মন্দির স্থাপত্য ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়ে উঠবে এবং ফলস্বরূপ স্থানীয় আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষগুলির জীবনের আর্থিক খরা কাটিয়ে সুস্থ জীবন কাটাতে পারে।

Reference:

১. হালদার, মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য, উবী প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৬
২. তদেব, পৃ. ৩৭
৩. মুখোপাধ্যায়, তুহিন, লোকায়ত শ্রী চৈতন্য, গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ২২
৪. তদেব, পৃ. ২৪
৫. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি তৃতীয় খণ্ড, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৪৬
৬. তদেব, পৃ. ৪৭
৭. তদেব
৮. The Indian Express ie বাংলা, ১১ অক্টোবর ২০২২, অনলাইন।
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. তদেব
১২. আন্দবাজার.com, ১৫ই অক্টোবর ২০২৫।
১৩. শ্রী শ্রী মা জহুরা কালি মন্দির, রাণাঘাট।
১৪. জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ নদীয়া, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৩০
১৫. তদেব
১৬. তদেব
১৭. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি তৃতীয় খণ্ড, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ২৪৭, ২৪৮
১৮. তদেব, পৃ. ২৪৮
১৯. তদেব
২০. দৃষ্টিভঙ্গি, অনলাইন, ২৪ জানুয়ারি ২০২৪।
২১. আনন্দবাজার পত্রিকা, অনলাইন, ২৬ মার্চ ২০১৫।
২২. তদেব
২৩. তদেব